OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 174 - 180
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্করের ‘গুরুদক্ষিণা’ উপন্যাসে প্রতিফলিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ও শিক্ষক সমাজের কঠিন বাস্তবতা

সুসমন দণ্ডপাট
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: susomandandapat@gmail.com
0009-0001-6552-7639

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Colonial Education system, Modernization of Education system, The Conflict between the Old and the New in Education, The Plight of Teacher,

Abstract
Our land of India is one of the original educational areas of the world. In this land, since ancient times, sages have been educating the younger generation. Later, this education went beyond the free environment of the ashram and was confined within the narrow confines of the four walls of the school. There was a radical change in the education system. In colonial India, the education system took a new turn. Crossing the boundaries of religion, philosophy and scripture, the common people focused on logic and argument, knowledge and science. Modernity touched their lives. The conflict between the old and the new began. Although the education system changed, the lifestyle of teachers did not change. Under the pressure of colonial rule, teachers did not get any opportunity to express their independent views. Teaching there had become only a means of earning a living. As a result, the real purpose of ideal teaching had been weakened to a large extent. However, there were some exceptional teachers who, despite enduring various forms of life-pains, suffering, injustice, and neglect, remained steadfast in their goal of changing society. They only gave to society, but received nothing in return. Society did not give them even the minimum respect. Novelist Tarashankar Bandyopadhyay has presented the life story of such a struggling teacher in his novel ‘Gurudakshina’ (1966). He has depicted the character of Chandrabhushan as a beacon of light in a degraded society. Chandrabhushan has shown the path to society by carrying the burden of education on his shoulders throughout his life. In return, he received disrespect and neglect. Tarashankar has presented the tragic story of a teacher's tormented life through his writings in the novel under discussion. Chandrabhushan has given his all to make students human beings. In return, he received a lot of deprivation, pain, contempt, and humiliation as Gurudakshina. This disrespect and suffering of teachers like Chandrabhushan is a long-standing problem of modern society. No one can say when this problem will be overcome. However, the ideal teacher class does not give priority to this problem. They dream of forming ideal students, forming an

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ideal society; because only an ideal student can bring about the intellectual and cultural development of a society.

Discussion

এক

শিক্ষা আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। আর এই স্বপ্নগুলিই বাস্তব হয়ে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলে। আমাদের ভারতভূমি পৃথিবীর আদি শিক্ষাক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ভূমিতেই প্রাচীনকাল থেকে মুনি-ঋষিরা নবীন প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। আধুনিক যুগে শিক্ষা গ্রহণের ধারা বদলেছে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষা আশ্রমের মুক্ত পরিবেশকে ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থারও বদল ঘটেছে, শুধু যা বদলায়নি তা হল শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও বিশ্বাস। গুরু আপন খেয়ালে তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে শিষ্যকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টাতে লিপ্ত থেকেছেন। একটা সুস্থ সমাজ গড়তে তাঁদের এই নিঃস্বার্থ দান কখনোই অস্বীকার করার নয়। অন্ধকার সমাজে আলোর শিখা জ্বালাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর থেকেছেন।

'Darkness, Darkness is everywhere' — সমাজ, মানুষের মন, বিশ্বাস, রীতি-নীতি সমস্তই অন্ধকারে ভরে গেছে। কোনো কিছুতেই আলোর শিখা নেই। এই অন্ধকারে প্রদীপ হয়ে যা আলো দান করবে, তা হল শিক্ষা। তৎকালীন বঙ্গদেশে শিক্ষাবিমুখ মানুষের সংখ্যা অধিক ছিল। তবে শিক্ষা অনুরাগী বা শিক্ষানবিশ ছিল না এ কথা অসত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা তৈরি হচ্ছিল। গ্রামীণ টোলগুলি বন্ধ হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বাংলার শিক্ষা অনুরাগীরা নিজস্ব ব্যয়ে গড়ে তুলেছিলেন ছোট ছোট বিদ্যালয়। আজকের নিরিখে ছোট মনে হলেও সেকালের নিরিখে বেশ বড়োই। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'গুরুদক্ষিণা' (১৯৬৬) উপন্যাসে এমনই এক বিদ্যালয় হল চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন। ব্যবসায়ী, শিক্ষা অনুরাগী চৈতন্যবাবু ব্যবসা থেকে কাঁচা টাকা লাভ করে একটি স্কুল তৈরি করেছিলেন। শুধু স্কুল বললে ভুল হবে, আদর্শ গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা করার চেষ্টা ছিল কীর্তিমান চৈতন্যবাবুর। বোর্ডিং স্কুল, ঘাট বাঁধানো দিঘী, কাছারি, গেস্ট হাউস, থিয়েটার বাড়ি, দাতব্য চিকিৎসালয় সবই ছিল বিল্বগ্রামে। চৈতন্য ইনস্টিট্যুশন গড়ে ওঠার পর থেকে প্রাণ আসে গ্রামের শিক্ষাব্রতী মানুষের মনে। চন্দ্রভূষণ দত্ত বিএ পাশ করেই এই ইনষ্টিট্যুশনের দায়িত্ব নেন।

দুই

চন্দ্রভূষণ দত্তের জীবনীটা একটু অন্য ধরণের। প্রথাগত নিয়মের ঘেরাটোপে তার ভাবনা আটকে নেই। তাঁর মনের ইচ্ছা শিক্ষকতা করা হলেও বাবার ইচ্ছা ওকালতি করানোর। যদিও বাবার ইচ্ছের কারণটা আক্রোশের। অভয়পুরের তন্তুবায়দের কাজকর্ম দেখতেন চন্দ্রভূষণের বাবা। সেখানে উন্নত মানের রেশমের চাষ হত। এই চাষ ইংরেজরা নিজেদের অধীনে করতে চাইল। ভুজঙ্গ দত্তকে ভয় দেখিয়ে কাজ না হওয়ায় তারা সবকিছু জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল। সবাই আসল কারণ জানলেও শুধুমাত্র উকিল মোক্তারের অভাবে উক্ত ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা গেল না। এ কারণেই তিনি চন্দ্রবাবুকে মোক্তার করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রভূষণ মনের তাড়নাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই যখন স্কুলের হেডমাস্টার হওয়ার প্রস্তাব এল তখন 'না' করতে পারেননি। কিন্তু পরে তিনি নিজের হৃদয় তাড়না থেকেই শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন—

> "চন্দ্রভূষণ 'না' বলেননি। উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন। ভারী ভালো লেগেছিল। ছাত্রজীবনেই এমন অযাচিত ভাবে চাকরি পাওয়া এবং যেমন তেমন নয় হেডমাস্টারির একটিনি এবং যে ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই ইস্কুলের হেডমাস্টারি— এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে!"[১]

চন্দ্রভূষণকে রেভারেন্ট মরিসন (ফাদার) একবার বড় শিক্ষাব্রতীদের কথা বলেছিলেন। চন্দ্রভূষণ বাবুর জীবনে যখন যন্ত্রণা ও দুঃখের দড়ি টানাটানি চলছিল তখন ফাদার তাঁকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। সেই মন্ত্রগুলি তাঁর কাছে মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে সঞ্চিত আছে। দেশের অন্ধকার ঘোচানোর জন্য আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস ব্যানার্জী, ফিলোসফার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গিরিশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখার্জী প্রমুখ শিক্ষা ও দেশসেবা ব্রতীদের নাম তুলে ধরেছিলেন। রেভারেন্ট মরিসন (ফাদার)-এর সেই মনীষীদের প্রসঙ্গে বলা কথাগুলি আজও চন্দ্রভূষণবাবু ভুলতে পারেন না। আর এই কথার রেশ থেকেই তিনি জীবনকে নতুন করে ভাবতে শিখেছিলেন—

> "এই দেশে আমরা আসিয়াছি নিপীড়িত মানুষের সেবা করিতে। তোমরা সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে! এত সহজে তোমরা পার। মধ্যে মধ্যে আমার বিস্ময় লাগে।"[২]

তিন

দেশনায়ক হবার ইচ্ছে চন্দ্রভূষণবাবুর ছিল না। দেশকে পরাধীনতা মুক্ত করতে শিক্ষাই যে একমাত্র উপায়, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে তাঁর মত ছিল না, তবে শান্তির অহিংস আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল ছেলেদের পড়াশোনা শিখিয়ে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে দেবেন। পড়াশোনার কালে তিনি বন্ধু সুপ্রকাশকে দেখে উৎসাহ পেয়েছেন। তিনি জানতেন সাহেবিয়ানার উত্তাপ গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মতো। তবে তাঁর নিজের অন্তরে কোনদিন সাহেব হবার ইচ্ছা ছিল না। তাই শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য তিনি ওকালতি করেননি। মাতৃবিয়োগ ছোটবেলাতেই হয়েছিল, পরে পিতৃবিয়োগ হলে চন্দ্রমাস্টার সম্পূর্ণ ধ্যান-জ্ঞান আরোপ করেছিলেন চৈতন্য ইনস্টিট্যুশনে; গড়ে তুলেছিলেন ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সোপান। এই শিক্ষকতা জীবনে বহুমুখী মনোভাবাপন্ন শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তবে তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াননি। এক আদর্শ মন নিয়ে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছেন। শিক্ষা নিয়ে যখনই কোন প্রশ্ন উঠেছে তখনই নিজে যুক্তি দিয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছেন। ফাঁকি নেই বরং যোগ্যতাকে আশ্রয় করে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে বদলানোর প্রভাব খাটিয়েছেন। অন্ধকারে টর্চ নিয়ে মানুষের মনে আলো জ্বালানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন চন্দ্রভূষণ। তাঁর বুকের ঝড় তোলপাড় করে তুলেছে শান্ত চোখ দুটিকে। একমাত্র মেয়ে বঙ্গবালাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন বি.এ পাশ করিয়ে তাকে দিয়ে নারীশিক্ষার আলো জ্বালাবেন। যদিও সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। বঙ্গবালা ফার্স্ট ডিভিশনে মেট্রিক পাশ করলেও রবিকে ভালোবাসার টানে আত্মহত্যা করেছে। এখানেই চন্দ্রবাবু স্বপ্নভঙ্গের প্রথম ধাক্কা খেয়েছেন। কন্যার অপমৃত্যুর কিছুদিন পরে এই শোকভার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন তাঁর পত্নী সত্যবতী। জীবনে এত দুঃখের জোয়ার আসলেও তিনি শিক্ষকতার আসন থেকে নিজেকে কখনোই সরিয়ে নেননি। দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে নিজের চরিত্রের একফোঁটাও পরিবর্তন করেননি। যতদিন বেঁচেছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে থেকেছেন।

চার

চন্দ্রবাবু ছিলেন ধর্মপ্রাণ সনাতনী। তিনি স্কুলে প্রথম থেকেই স্তোত্র পাঠের প্রথাটি চালু রেখেছেন—

> "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ
> স্তমস্য বিশ্বস্য পরমনিধানম্।"[৩]

মুসলমান ছাত্ররা গীতার স্তোত্র পাঠ করতে চায়নি। ফলে আবু হোসেনের দেওয়া দরখাস্তে টনক নড়েছিল চন্দ্রবাবুর। কমিশনার সাহেবও বন্ধ করতে চেয়েছিলেন স্তোত্রটি। কিন্তু ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর সাহেবের মধ্যস্থতায় তা বন্ধ হয়নি। চন্দ্রবাবুই ইন্সপেক্টর ও কমিশনার সাহেবকে গীতার মত পবিত্র গ্রন্থের স্তোত্রের অর্থ বুঝিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর জোন্স সাহেব গীর্জার উপাসনা কালের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা নিয়ে এই সংগীত ও তার ব্যখ্যা শুনে চন্দ্রভূষণবাবুকে বলেছিলেন—

> "তোমাদের ওই প্রার্থনা সংগীত যেন তোমরা তুলে দিও না। উপর থেকে খোঁচা বা বন্ধ করার হুকুম আসবে না— এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। সে পথ আমি বন্ধ করে যাব।"[৪]

সেদিন থেকে এই স্তোত্র আর ওঠেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই স্তোত্র পাঠই চন্দ্রভূষণ বাবুর শেষ জীবনে কাঁটা হয়ে উঠেছিল। নাস্তিক্যবাদ শিক্ষাব্যবস্থা যখন ছাত্রদের মস্তিষ্ক জুড়ে আটকে বসল তখন চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অপবাদ আসতে থাকল। ছাত্ররা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। চন্দ্রবাবু নাকি তাদের স্তোত্রপাঠ করতে বাধ্য করান। আসলে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনেরও পরিবর্তন ঘটে। সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি থেকে তো আর সামাজিক মানুষের মনকে দূরে রাখা যায় না। নাস্তিক্যবাদ ধারণা যেহেতু আধুনিকতার এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল সেহেতু সেই স্রোতে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছাত্ররাও গা ভাসাতে থাকে। ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝার দরকার নেই, যুগের হাওয়ায় ভাসা নিয়ে কথা। যুগের স্রোতে ভেসেই ছাত্ররা অভিযোগ করতে থাকে তাদের শ্রোতবিমুখ মাস্টারমশাইয়ের দিকে। দরখাস্ত দেয় চন্দ্রভূষণ বাবুর একসময়ের প্রিয় ছাত্র সীতেশ। এই অনভিপ্রেত ঘটনায় চন্দ্রবাবু মর্মাহত হয়ে পদত্যাগ পত্র দিয়ে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ সকরুণ উক্তি ছিল—

> "গুড বাই বয়েজ, মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আই সাবমিট মাই রেজিগনেশন। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি ঈশ্বর মানি— তোমরা মানো না— তোমাদের শিক্ষা দেবার শক্তি আমার নেই। গুডবাই। গুডবাই।"[৫]

স্কুল থেকে বেরিয়ে সামনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে মুখ থুবড়ে পড়ে যান চন্দ্রবাবু। মেয়ে বঙ্গবালাকে স্মরণ করতে করতে তিনি জগৎ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। আর এখানেই তাঁর অতৃপ্ত শিক্ষক আত্মার মুক্তি ঘটে।

পাঁচ

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর 'গুরুদক্ষিণা' উপন্যাসের নামকরণটি বেশ ব্যঙ্গার্থক ভাবেই ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনকালে গুরুর আশ্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ছাত্রদের গুরুদক্ষিণা দিতে হত। আধুনিককালে অবশ্য এ নিয়মের মুক্তি ঘটেছে। এ সমাজে বলা হয় শিক্ষা দান। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে শিক্ষক রামজয় বাবুর বাবার কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ —

> "শিক্ষা তো দান করতে হয়, বেতন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া তো শিক্ষা-বিক্রয়ের চেয়েও হীন কর্ম্ম।"[৬]

তবে আধুনিক কালের শিক্ষকেরা সরস্বতী আরাধনা করার পূর্বে লক্ষ্মীলাভের কথা ভেবে থাকেন। কেন না অভুক্তপেটে তো আর শিক্ষাদান করা যায় না। তাই সবাই ন্যূনতম খোরাকি নিয়েই শিক্ষাদান করে থাকেন। চন্দ্রভূষণ বাবু অবশ্য এসব থেকে একটু ভিন্ন। তিনি বেতন নিয়ে ভাবেন না। শিক্ষাদান করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। টিউশন প্রথায় নেমে উপার্জন বাড়ানোর কথা চিন্তা করেন না। তিনি লোকদেখানি শৌখিনতায় বিশ্বাসী নন। তবে একটি বিষয়ে তিনি কঠোর ও কঠিন সিদ্ধান্তের অধিকারী; সেটি হল শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে। নিজে কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি এবং কেউ করলে তিনি চন্দ্রবাবুর হাত থেকে রেহাই পাননি। গুরু হিসেবে রামজয় বাবুর মতো ছাত্রদের কাছে চাদর, কাপড় কিছুই প্রত্যাশা রাখেননি। পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের থেকে সম্মান, ভক্তি ও নৈতিকতার আভরণের স্পর্শ চেয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রাণপ্রিয় ছাত্ররা এটুকুও দিতে পারে না, তখন আত্মগ্লানিতে নিজেকে ব্যর্থ ভেবে শিক্ষাদানের পথ থেকে সরে এসেছেন। সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা এসবই তো একজন শিক্ষকের কাছে গুরুদক্ষিণা কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি পেলেন অবাধ্যতা, ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসাযুক্ত গুরুদক্ষিণা। একজন সৎ, আদর্শবান মাস্টারমশাইয়ের এই ধরণের গুরুদক্ষিণা কি প্রাপ্য ছিল? এ কারণেই ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর চন্দ্রবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষকের জীবনের বেদনা সমন্বিত মৃত্যু ঘটিয়েছেন। কেননা যদি চন্দ্রবাবুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না ঘটাতেন তাহলে ইস্তফাপত্র দিয়ে বাকি জীবন ভোগ বিলাসে কাটানো নিরর্থক হত। আর তাতে আদর্শ শিক্ষক চরিত্রের অপমৃত্যু ঘটত।

ছয়

'গুরুদক্ষিণা' উপন্যাসে রয়েছে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্বের হাওয়া। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকত তুলে ধরতে গিয়ে কালের দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা প্রবেশ করতে লাগলে ভারতীয়দেরকেও সেই শিক্ষা নিতে হয়। ফলে তাদের মনে নিত্যনতুন বিজ্ঞান চেতনা থেকে নাস্তিক চিন্তাভাবনা ঘুরতে থাকে। তারা ধর্ম মানে না, মাতৃভাষা চর্চার চেয়ে ইংরেজি চর্চায় বেশি গুরুত্ব আরোপ করে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে, শ্রদ্ধা-ভক্তি মন থেকে লুপ্ত হয়। সমাজে জাতিভেদ প্রথা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে, ছেলেদের মন অসহিষ্ণু হয়ে যেতে শুরু করে। এসব চন্দ্রভূষণ মাস্টারের পছন্দ নয়। তিনি বাঙালি ছেলেদের মধ্যে আদ্যোপ্রান্ত শিক্ষিতের ছাপ দেখতে পান। চোখে থাকবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্ঞানের দীপ্তি, ব্যবহার হবে নমনীয়, আচরণ হবে সহনশীল। এইসবই তো একজন আদর্শ ছাত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। তবে পাঠকদের মনে হতে পারে তিনি যৌবনের আবেগকে রোধ করতে চেয়েছেন, তা কিন্তু একদমই নয়। তারাশঙ্কর সুচতুরভাবে শিক্ষক চন্দ্রভূষণকে অভিভাবকসুলভ মাস্টারমশাই হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রত্যেক বাবা যেমন চান তার সন্তান জ্ঞানের আলো জ্বেলে সমাজ ও দেশ পরিবর্তন করে ঠিক তেমনই। তাই ছাত্রদের রাজনৈতিক ডিবেটিং ক্লাব কালচার বা খেলাধুলা করতে গিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়ানোটা কখনোই অভিভাবক হিসেবে হেডমাস্টার মহাশয় চাননি। শান্তিপ্রিয় চন্দ্রভূষণ শিক্ষকতা জীবনে যেমন নিজে কখনোই ঔদ্ধত্য দেখাননি তেমনই শাসন করার ব্যাপারেও কাউকে ভুল করতে দেখলে থেমে থাকেননি। ছাত্র হোক বা মাস্টারমশাই অন্যায় দেখলেই তার তীব্র বিরোধীতা করেছেন। আসলে চন্দ্রভূষণের অন্তরে রয়েছে শিক্ষা দেবার মহিমায় দেশ সেবার ব্রত। ভারতবর্ষের অন্ধকার দূর করার মন্ত্র। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার দূরীভূত করার অদম্য জেদ।

চন্দ্রভূষণ বাবু একজন আদর্শ শিক্ষক, তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রগতিবাদী মনোভাব। তিনি ছাত্রদের কথা চিন্তা করেই তো জীবনের সত্তর বৎসর কাটিয়েছেন। সংসারের প্রতি তাঁর ততটা মনোযোগ ছিল না যতোটা ছিল ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি ছাত্রদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার বিষয়ে কখনোই আপোষ করেননি। তাই একমাত্র কন্যার মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়—

> “কান্না তো আসছে না রামজয়! আর আমি কি কাঁদতে পারি? মৃত্যু অনিবার্য, শোক মিথ্যা; আমি শিক্ষক; আমি জ্ঞানের তপস্বী; আমি কি করে কাঁদব— এই এত ছেলে যারা আমার কাছে শিক্ষা পেতে এসেছে এরা ভবিষ্যতে শোকে-দুঃখে যে তাহলে বানের মুখে কুটোর মতো ভেসে যাবে।[৭]

তাই জীবনের শেষ লগ্নে হেডমাস্টারের দায়িত্ব ত্যাগ করেও তিনি শান্ত থাকেননি। সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব নিয়ে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনে আমৃত্যু উত্তর প্রজন্মকে পথ দেখানোর পথযাত্রী হয়ে থাকতে চেয়েছেন। জীবনে একের পর এক সঙ্গী-সাথী চলে গেলেও তিনি নিজে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যেতে চাননি। প্রধান সম্বল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনকে। তাই চাকরি জীবনের শেষটা এমন হতে পারে কোনদিন তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। আচ্ছা, শিক্ষকদের জীবনের চাহিদা কী? তাঁরা আসলে কি চান? সমাজই বা তাঁদের কি দিতে পেরেছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজানা।

সাত

উপন্যাসটিতে বেশ অনেকবারই শিক্ষার নিয়মনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষরা যে অন্ধকারে ডুব দিয়ে চলেছে সে প্রসঙ্গও রয়েছে। তাই চন্দ্রভূষণ বাবু Annual Report - এ বারবার ‘Light’ এবং ‘Darkness’ কথাগুলির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেছেন। কেননা তিনি চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশন স্থাপনকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যখনই শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো সভা-সমিতি হয়েছে, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবুকে ‘টর্চ বেয়ারা’ বলে আলোর দিশারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। চন্দ্রবাবু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলেছিলেন—

> “Then there came a torch bearer in that darkness. A great soul, a true lover of light - light of knowledge.”[৮]

জগতের নিয়মে যখন পুরাতনের বদল ঘটেছে তখন চন্দ্রভূষণ মাস্টার সবাইকে নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আসলে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যবাবু স্কুল তৈরি করে জ্ঞানের নতুন মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মশালে তেল দিয়ে আলো বর্ধন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন চন্দ্রভূষণ বাবু। অমরবাবু চেয়েছিলেন চন্দ্রবাবুর হাতে যে মশাল রয়েছে সেই মশালে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে যাঁরা তেল দিয়ে আলো জ্বালাতে সাহায্য করেছে তাঁরাই এই ইন্সটিটিউশনে থাকুক। তাই যাঁরা একঘেয়ে পুরানো চালে স্কুল চালাতে চেয়েছে তাদের স্কুল ছাড়তে হয়েছে। রামরতন বাবুরা যেদিন স্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন সেদিন তিনি বলেছিলেন—

> “এই অন্ধকারের মধ্যে এই ইস্কুলটি চণ্ডীমণ্ডপে দশবাতি আলোর মতো জ্বেলে দিয়েছেন এখানকার এক মহাপুরুষ। সেই দশবাতি আলোটি পঞ্চাশ বাতি— একশ’ বাতি— হাজার বাতি হয়ে উঠুক। তোমরা যত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> দলে দলে আসবে— বসবে মণ্ডল করে— তত জোর হবে আলোর। মাস্টারেরা বাতিবরদার, তেল যোগাবেন, চিমনি মুছবেন, পলতে কাটবেন। ...তা হোক— আলোটি উজ্জ্বল হোক— তার ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বাড়ুক। তোমরা কিন্তু বাবু ভালো করে পড়াশোনা করো, মানুষের মতো মানুষ হতে পেরো।”[৯]

প্রবহমান সময়ের স্রোতে বিদায় নিয়েছেন মৃগাঙ্ক বাবু, যামিনী বাবু, গোপাল বাবু, যতীন বাবু ও রামরতন বাবু আর যুক্ত হয়েছেন মাখনলাল ও ব্রজবাবুর মতো লোকেরা। ব্রজবাবুর মতো শিক্ষকেরা পরবর্তী দিনে কড়া হাতে ইস্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদের হাতেই রক্ষিত হয়েছে চৈতন্য ইনষ্টিট্যুশনের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ।

আট

সে যুগে বাঙালি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপ্লবী সত্তা জেগে উঠেছিল। তারা গোপনে বিপ্লবী দলে নাম লেখাতে শুরু করে। ফলে সরকার তাদের আন্দোলন রোধ করার জন্য ‘পেডলার সারকুলার’ শিক্ষানীতি চালু করে। শুরু হয় বিপ্লবী ছাত্রদের ধড়পাকড়। এই ঘটনা দেখে চন্দ্রভূষণ বাবু চিন্তায় পড়েন। তাই তিনি ছাত্রদের ওপর রাগ বাড়িয়ে কাউকে স্বদেশী আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যোগে বাধা দিতে থাকেন। সচেতক হেডমাস্টার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই ছাত্রদের সহিংস আন্দোলনের আবেগকে গুরুত্ব দেননি। ধারাবাহিক অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে তিনি শক্ত প্রাচীর হয়ে ছোট ছোট কিশলয়গুলিকে বাহ্যিক আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। তবে চন্দ্রভূষণ বাবুর প্রতি ঔপন্যাসিক সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সমালোচক শ্রীক্ষেত্র গুপ্তের কথায়—

> “চন্দ্রভূষণের বাল্য-কৈশোর-যৌবন ধারাবাহিক ভাবে বিধৃত হয়েছে। তবে তা নায়কের ব্যক্তিত্ব নির্মান শুধু নয়; উপন্যাসের থিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। সমকালীন শিক্ষাজগতের একটা ছবি এঁকেছেন; গ্রামীন শিক্ষা, প্রাথমিক স্তরের পাঠশালা, টোল মাদ্রাসা-মক্তব ইংরেজি স্কুলের শিক্ষা, কলকাতার কলেজের শিক্ষা। এইসব গল্পের মত করে বলা; বিবরণ ধর্মী নয়। ...আদর্শবাদী শিক্ষক শিবচন্দ্র অন্ধকার দেশে শিক্ষার আলো আনবার জন্য ব্যাকুল, ভাবপ্রবণ ফাদার— নানা মানুষের খন্ডচিত্র আঁকতে আঁকতে ঐ শিক্ষার জগতটা ঘুরে এসেছে উপন্যাসে।”[১০]

সমগ্র উপন্যাসে শুধু চন্দ্রভূষণের জীবনী ও শিক্ষক চরিত্রই আলোচিত হয়নি, সমকালীন শিক্ষা জগতের সামগ্রিক রূপরেখাও চিত্রিত হয়েছে। গ্রামীণ শিক্ষা, প্রাথমিক স্তরের পাঠশালার পাঠ্যবিষয়, টোল-মাদ্রাসা-মক্তবের রীতি-নীতি, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, কলকাতার কলেজগুলির পঠন পদ্ধতি, ইংরেজি স্কুলগুলির উদ্দেশ্য— এসব বিষয় সমগ্র উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

নয়

তারাশঙ্কর শুধু কাহিনীবৃত্ত দিয়েই সম্পূর্ণ উপন্যাস ভরিয়ে তুলেছেন এমনটা নয়, এর অলিন্দে অলিন্দে তিনি পাঠকদের ভবিষ্যতের শিক্ষাপদ্ধতি ও বাঙালি জাতির অগ্রগতির রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন। লেখক চন্দ্রভূষণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে অন্ধকার মোচনের পথ দেখিয়েছেন। চন্দ্র যেমন ঘন তমসাছন্ন রাত্রির স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে, উপন্যাসেও তেমনি শিক্ষক চন্দ্রবাবু শিক্ষার মশাল নিয়ে অন্ধকারাছন্ন সমাজকে দিশা দেখিয়েছেন। আর তাঁর ভূষণ উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে বাড়ছে গ্রামবাংলার ছাত্রদের হৃদয়-রন্ধ্রে। তারাশঙ্করের ‘গুরুদক্ষিণা’ উপন্যাসেই শুধু নয়, ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসেও শিক্ষকের স্বপ্ন দেখার ইতিবৃত্ত রয়েছে। সীতারাম মাস্টারও চন্দ্রভূষণের মতো বৈষম্যহীন শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশে শিক্ষার রূপরেখা তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিল। নর্মাল ফেল করেও জমিদারের ইচ্ছায় পাঠশালা খুলেছিল। সমাজের নানা বাধা-বিপত্তি আসলেও মনোবল হারাননি বরং স্থির সূর্যের মতো আলোর দীপ্তি দান করে গেছেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে শিক্ষক চরিত্রের ওপর যে কত আঘাত বঞ্চনা এসেছে তার শ্রেষ্ঠ দলিল হিসেবে শিক্ষক চরিত্রগুলি উপন্যাসের পাতায় উঠে এসেছে। তারাশঙ্করের ‘গুরুদক্ষিণা’ উপন্যাসও শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের ক্ষতচিহ্নের ইতিহাস হয়ে উঠেছে। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার-এর মন্তব্যটি এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে —

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 22
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 180
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আগের পর্বের 'সন্দীপন পাঠশালা'র সঙ্গে উত্তর পর্বের 'গুরুদক্ষিণা'র তুলনা করা যায়। 'গুরুদক্ষিণা' নামকরণের মধ্যেই বর্তমানের প্রতি বিদ্রুপ সহানুভূতি এখানে পুরোপুরি পুরানো ভাবাদর্শের প্রতি। সমাজের মাত্রাও এখানে অনুপস্থিত উপন্যাসটিতে।"[১১]

সামগ্রিকভাবে বলা যায় চন্দ্রভূষণ চরিত্রটি মোমবাতির মতো, যে নিজে পুড়ে অপরকে আলো দান করে। তিনি অবক্ষয়িত সমাজের আলোর দিশারী হিসেবে কাজ করেছেন। চন্দ্রভূষণ মাস্টারমশাই হিসেবে সমগ্র জীবন শিক্ষার পুঁটলি কাঁধে নিয়ে অগ্রদূত হয়ে সমাজকে পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদানে পেয়েছেন অসম্মান ও অবহেলা। তারাশঙ্কর আলোচ্য উপন্যাসে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এক শিক্ষকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের করুণ কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। চন্দ্রভূষণ ছাত্রদের মানুষের মতো মানুষ করার লক্ষ্যে তাঁর সর্বস্ব দান করেছেন। বদলে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পেয়েছেন একরাশ যন্ত্রণা, অবজ্ঞা ও অবমাননা। চন্দ্রভূষণের মতো শিক্ষকদের এই অপ্রাপ্তি, অসম্মান ও যন্ত্রণা আধুনিক সমাজের দীর্ঘকালের সমস্যা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণ কবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আদর্শ শিক্ষককূল এই সমস্যাকে প্রাধান্য দেন না। সেকারণেই হয়তো গুরুরা নীরব যন্ত্রণা সহ্য করেও আদর্শের পথ থেকে সরে আসতে পারেন না।

Reference:

১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার (সম্পা.), *তারাশঙ্কর রচনাবলী (উনবিংশ খণ্ড), 'গুরুদক্ষিণা'*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৫৪
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮
১০. গুপ্ত, ক্ষেত্র, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, ৪৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৭ আশ্বিন, ১৩৫৮, পৃ. ১৩৬
১১. সিকদার, অশ্রুকুমার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৪